থিয়েটারের ভাষা এবং শম্ভু মিত্র

সৌমিত্র বসু

শম্ভু মিত্রের নাটক প্রথম দেখেছিলাম স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়বার সময়। আর তাঁর কাছাকাছি আসবার সুযোগ পাই কলেজে উঠে, বড়জোর বছর চারেক। শম্ভু মিত্র বহুরূপী ছেড়ে দেওয়ার পর সেই নিয়মিত আর যোগাযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কোনও কোনও স্মৃতি এতদিন পরেও মনের মধ্যে আলো জ্বেলে দিতে পারে। আমি ঠিক ভক্ত ধরনের মানুষ নই। তাঁকে নিয়ে নানা ঘটনার কথা বলার চেয়ে একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করতে আমার বেশি ভালো লাগবে। যেমন একশো বছরের মুখে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়, এখনকার ছেলেমেয়েরা কি জানে শম্ভু মিত্র কেন বড় মাপের অভিনেতা এবং পরিচালক? উপলক্ষ্যটা সামনে রেখে সত্যি সত্যি শম্ভু মিত্রকে অন্তত নিজের কাছে যাচাই করে নিতে ইচ্ছে করছে। শুধু অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষ নন, যে কোন শিল্পীর মধ্যেই তিনটি গুণ থাকা খুব জরুরী। এমনকি এই তিনটের একটা বাদ দিলেও তাঁর আর শিল্পী হওয়া হয় না — এমনটাই আমার মনে হয়। এক, তাঁর কল্পনা করার ক্ষমতা। দুই, সেই কল্পনাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাওয়ার স্বভাব। আর তৃতীয়টা হল তাঁর নিজের শিল্পের ভাষায় তার কিছু অনুষঙ্গ তৈরী করে ফেলা, যার মধ্যে দিয়ে সেই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিটা বেরিয়ে আসতে পারে। এই তিন গুণের মিশেল কেমন করে হয়েছিল মানুষটার মধ্যে, তাই নিয়ে দু-একটা গল্প বলি। তখন আমি বহুরূপী তে, বাইরে থেকে চার অধ্যায় দেখার অনুমতি পেয়েছি। নাটকের পর সাজঘরে যেতেই প্রশ্ন — কেমন লাগল? 'খুব ভাল' বলতে না বলতেই পরের প্রশ্ন — কেন ভাল লাগল? আমি বললাম, উপন্যাসটা পড়ে যা বুঝতে পারিনি নাটক টা দেখে সেগুলো বুঝতে পারলাম। মেকআপ তুলতে তুলতে চোখের কোনা দিয়ে একবার অপাঙ্গে দেখলেন শম্ভু মিত্র, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমাদের নাটকটা তাহলে নোট বইয়ের মত? পড়ে যা বোঝা যায় না, সেটা বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ? ক্লিন বোল্ড। এর কি কোনও উত্তর হয়! নিরুপায় হয়ে যদি প্রশ্ন করা যায়, তাহলে আপনিই বলে দিন থিয়েটারের কাজটা কী — তারও কোনও নোটবই মার্কা জবাব পাওয়া যাবে না। নিস্পৃহ গলায় তিনি বলবেন — ভাবো, ভেবে বার করো।

অর্থাৎ, মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগাও কিন্তু উত্তরটা তোমাকেই খুঁজে বার করতে হবে।

চার অধ্যায় নিয়ে কথা উঠেছে যখন সেই প্রসঙ্গে আর একটু বলি। যাঁরা নাটকটা দেখেছেন তাঁরা শুরুর দিকটা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন। সব আলো নিভে গেলে নেপথ্য থেকে ভেসে আসত গম্ভীর গলায় চণ্ডীর স্তোত্র, যার মোটামুটি বাংলা হল — বাঘছাল পরা, শুষ্ক মাংসে ভয়ঙ্করী, বিশাল হাঁ হয়ে রয়েছে, লকলক করছে তাঁর জিভ, রক্তলাল চোখে সেই মূর্তি হুঙ্কারে চারদিক প্রকম্পিত করে তুলেছে। এই স্তোত্র শেষ হতে না হতেই শোনা যেত বহুকণ্ঠের একটা সুর, সেটা শেষ হল বন্দেমাতরম্-এ গিয়ে। তিনবার বন্দেমাতরম্ বলার পর শোনা যেত গুলির শব্দ। দু-এক পলকের জন্য নিস্তব্ধতা। তারপর একটু ঢিমে ভাবে শোনা যেত কথাহীন সেই সুর, যেন তার মধ্যে ব্যর্থতার কষ্ট মিশে যাচ্ছে। একটু খতিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, এই প্রারম্ভিক আবহটা, যাকে থিয়েটারের ভাষায় বলে ওভার্চার — কতগুলো স্তরে কতরকম অনুষঙ্গকে প্রকাশ করছে। কালীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে হিংস্রতার। একটা সময় ডাকাতরাও তো কালীভক্ত হত। বন্দেমাতরম্-এর সঙ্গে কালীস্তোত্র মিশিয়ে তাহলে স্বদেশি ডাকাতের একটা অনুষঙ্গ বুনে দেওয়া হল। নিশ্চয়ই মনে আছে, স্বদেশিদের ডাকাতি করার একটা গল্প আছে চার অধ্যায় উপন্যাসে, যে ডাকাতদলে থেকে অতীনের মনে হয়েছিল সে তার স্বভাবকে হত্যা করেছে, সব হত্যার চেয়ে যা বড় পাপ। ওভার্চারের পর এই কালী আবার ফিরে আসবেন দ্বিতীয় দৃশ্যে। এলার ঘরের একপাশে রাখা থাকবে কালীর একটা ছবি, জবা ফুল দিয়ে আচ্ছন্ন। দৃশ্যের প্রায় শেষে ছমছমে উৎকণ্ঠার মুহূর্তে মঞ্চের সব আলো নিভে যাবে। শুধু একটা আলো পড়ে থাকবে সেই ছবির উপর। হিংসা যেন দীর্ঘ ডানা দিয়ে ঢেকে দিতে চাইবে এলা আর অতীনের ভালোবাসাকে। কল্পনা, যুক্তি আর থিয়েটারের নিজস্ব ভাষার একটা চমৎকার যোগাযোগ তৈরী হল না এখানে?

থিয়েটার যাঁরা করেন তাদের আরও একটা সমস্যার জায়গা আছে। গল্প-উপন্যাসে চট করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যাওয়া যায়, এক সময় থেকে আর-এক সময়ে। নাটকে তো একটা স্থানু দৃশ্য দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে যাব কী করে? এলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্ত দু'লাইন কবিতা বলে ওঠে — প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস / তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ। কথা থেকে কবিতায় এই যাত্রাকে সহসা কেমন করে ধরবেন নির্দেশক? আপাতচোখে খুব সহজ একটি পথ নিলেন শম্ভু মিত্র, চরিত্রদের উপর থেকে আলো অবলুপ্ত হয়ে গেল সেই সময়। পেছনের পর্দায় বাড়লো আলো। ছায়ামূর্তির মত দেখা যায় অন্ত আর এলাকে। ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টা নেই। পুরোটাই

হল অনায়াসে। শুধু এই আলো বাড়া কমার পরিকল্পনায় এলার ঘর মুহূর্তে কোনও অবাঙমানসগোচর অনন্তের আশ্রয় পেয়ে যায়। এত অনায়াসে যিনি মঞ্চের উপর স্থানকালের বেড়া ভেঙে দিতে পারেন, তাঁকে বড় বলে স্বীকার না করে উপায় আছে কি?

নির্দেশকের একটা বড় কাজ মঞ্চে কিছু ছবি তৈরী করা, যে ছবিগুলো কেবলমাত্র সুন্দর হয়েই থাকবে না, নাটকের সঙ্গে জুড়ে তাদের কিছু তাৎপর্যও গড়ে নিতে পারবে। যেমন ধরা যাক, রাজা অয়দিপাউসের কথা, নাটকটা শুরু হত যখন, মঞ্চের উপর একদল মানুষ হাঁটু মুড়ে মাথা মাটিতে নামিয়ে বসে আছে। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে তারা হাত তুলে রাজাকে ডাকে। রাজা অয়দিপাউস কে দেখা যায়, সেইসব দলা পাকানো, মাথা নীচু করে থাকা দঙ্গলের থেকে অনেকটা উপরে, সূর্যের ফলক লাগানো একটা তোরণ, তার দুই থামের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নাটকের শেষে সেই উঁচু তোরণ থেকে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসবেন তিনি — পরাজিত, রক্তাক্ত, সর্বস্বান্ত। নাটকে আর একটা জায়গা ছিল যেখানে মেষপালকের কাছ থেকে অয়দিপাউস জানতে চাইছেন তাঁর নিজের পরিচয়। অয়দিপাউস বেশ খানিকটা উঁচুতে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে, মেষপালক নীচে মাটিতে প্রায় আধশোয়া অবস্থায়। মেষপালক আর্তকণ্ঠে বলে, আমি এক সর্বনাশের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। শোনামাত্র রাজা, আমিও সেই সর্বনাশের কিনারায় — বলেই উঁচু বেদী থেকে ঝাঁপ দেন, গলা টিপে ধরেন মেষপালকের। সর্বনাশের কিনারায় বলার পরেই অমন ঝাঁপ দেওয়ায় কি মনে হয় না যে মানুষটা সত্যিই সর্বনাশের গহ্বরেই ঝাঁপ দিলেন? এই জায়গায় আলোর একটা কায়দা ছিল। বেদীর উপর শম্ভু মিত্রকে ধরে থাকত একটা আলো, নীচে মেষপালককে আর একটা। মাঝখানে থাকত অন্ধকার ফাঁক। যখন লাফ দিয়ে তিনি পড়তেন, মাঝখানের ওই

ছেঁড়াতার

অন্ধকার অংশটা পার হয়ে যেতেন পলকের মধ্যে। মনে হত কত উঁচু থেকে নীচে এসে পড়লেন অয়দিপাউস। সাধারণ অদীক্ষিত দর্শক যারা তারা কি আর এমন করে লক্ষ্য করেন সব? করেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথাও একটা ব্যাখ্যার অতীত ভালো লাগা তৈরী হয়ে যায় এর ফলে। এইসব টুকরো টুকরো কাজগুলো জুড়েই একটা সামগ্রিকতার চেহারা ফুটে ওঠে। যারা এই নাটকগুলি দেখেননি, এইসব অযোগ্য বর্ণনা পড়ে তাদের কি হবে? ছবি দেখা বা গান শোনার অভিজ্ঞতা যেমন ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব, থিয়েটারের অভিজ্ঞতা তো তাই-ই।

আজকের দিনে যে কথাটা বিশেষ করে মনে হয় — শম্ভু মিত্র বা তাঁর সমকালীন অন্য অনেকেই থিয়েটারটা করতে চেয়েছিলেন নিজেদের জীবনদর্শনকে প্রকাশ করার উপায় হিসেবে। তাঁদের কাজগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে ভাবনার ধারাবাহিকতা আর বিবর্তনের চেহারাটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এখন যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সকলের বেলায় এই কথাটা খাটবে কিনা জানিনা। আর দ্বিতীয় কথা হল, থিয়েটারের শর্তেই তিনি জীবন বা সমাজকে বুঝতে শিখেছেন। যে কোনও বিষয় বোঝাতে গেলে তাই নাটকের উদাহরণ চলে আসত তাঁর কথার মধ্যে। আর আসত কি অমোঘ ভাবে তা নিয়ে একটা গল্প বলেই এই লেখা শেষ করব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সাম্মানিক ডি.লিট দেওয়া হবে শম্ভু মিত্রকে। আমার উপরে পড়েছে তাঁকে নিয়ে আসা ও দিয়ে আসার ভার। ফেরার পথে গাড়িতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত সব ছেলে কেমন টাই পরে পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দেখেছিলে? দেখেছি। এই গরমের দেশে টাই না পরলে কি হয়? কী আবার হবে? কিছুই হয় না। চুপ করে শুনছি তাঁর কথা। শম্ভু মিত্র বললেন, তোমার মনে হয় না এখানে যদি রঞ্জন এসে খুব একচোট হেসে নিত তাহলে বেশ হতো? উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। যক্ষপুরীর সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করে মিলিয়ে দেওয়ার ভাবনা বুঝি তাঁর পক্ষেই ভাবা সম্ভব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, সৌমিত্র বসু